প্রবন্ধ

ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

2021

সূচিপত্র

- ঝান্‌সীর রানী 2
- কাজের লোক কে 11
- গুটিকত গল্প 16
- আকবর শাহের উদারতা 22
- ন্যায় ধর্ম 23
- বীর গুরু 25
- শিখ- স্বাধীনতা 32
- গ্রন্থসমালোচনা 37
- ঐতিহাসিক চিত্র 41

ঝান্‌সীর রানী

আমরা এক দিন মনে করিয়াছিলাম যে, সহস্রবর্ষব্যাপী দাসত্বের নিপীড়নে রাজপুতদিগের বীর্যবহ্নি নিভিয়া গিয়াছে ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের দেশানুরাগ ও রণকৌশল ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে দিন বিদ্রোহের ঝটিকার মধ্যে দেখিয়াছি কত বীরপুরুষ উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া স্বকার্য-সাধনের জন্য সেই গোলমালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যুঝাযুঝি করিয়া বেড়াইয়াছেন। তখন বুঝিলাম যে, বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে যে-সকল গুণ নিদ্রিতভাবে অবস্থিতি করে, এক-একটা বিপ্লবে সেই-সকল গুণ জাগ্রত হইয়া উঠে। সিপাহি যুদ্ধের সময় অনেক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁহাদের বীর্য অযথা পথে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিলেও মানিতে হইবে যে, তাঁহারা যথার্থ বীর ছিলেন। তাঁতিয়া টোপী ও কুমারসিংহ ক্ষুদ্র দুইটি বিদ্রোহী মাত্র নহেন, ইতিহাস লিখিতে হইলে পৃথিবীর মহা মহা বীরের নামের পার্শ্বে তাঁহাদের নাম লিখা উচিত; যে অশীতিবর্ষীয় অশ্বারোহী কুমারসিংহ লোলভ্রূ রজ্জুতে বাঁধিয়া হস্তে কৃপাণ লইয়া হাইলন্ডের সৈন্যদলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁতিয়া টোপী কতকগুলি বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল লইয়া যথোচিত অস্ত্র নাই, আহার নাই, অর্থ নাই, অথচ ভারতবর্ষে বিদেশীয় শাসন বিচলিতপ্রায় করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহাদের কার্য লইয়া গৌরব করিবার আমদিগের অধিকার নাই তথাপি তাঁহাদের বীর্যের, উদ্যমের, জ্বলন্ত উৎসাহের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষের কী দুর্ভাগ্য, এমন সকল বীরেরও জীবনী বিদেশীয়দের পক্ষপাতী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

সিপাহি যুদ্ধের সময় রাসেল টাইম্‌স্‌ পত্রে লিখেন যে, “তাঁতিয়া টোপী মধ্য ভারতবর্ষকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; বড়ো বড়ো থানা ও ধনাগার লুঠ করিয়াছেন, অস্ত্রাগার শূন্য করিয়াছেন, বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়াছেন, বিপক্ষ সৈন্য বলপূর্বক তাঁহার সমুদয় অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আবার যুদ্ধ করিয়াছেন, পরাজিত হইয়াছেন, পুনরায় ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের নিকট হইতে কামান লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, বিপক্ষ

সৈন্যেরা পুনরায় তাহা অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আবার সংগ্রহ করিয়াছেন, আবার হারাইয়াছেন। তাঁহার গতি বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত। সপ্তাহ ধরিয়া তিনি প্রত্যহ ২০/২৫ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছেন, নর্মদা এপার হইতে ওপার, ওপার হইতে এপার ক্রমাগত পার হইয়াছেন। তিনি কখনো আমাদের সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া, কখনো পার্শ্ব দিয়া, কখনো সম্মুখ দিয়া, সৈন্য লইয়া গিয়াছেন। পর্বতের উপর দিয়া, নদী অতিক্রম করিয়া, শৈলপথে, উপত্যকায় জলার মধ্য দিয়া, কখনো সম্মুখে, কখনো পশ্চাতে, কখনো পার্শ্বে, কখনো তির্যকভাবে চলিয়াছেন। ডাকগাড়ির উপর পড়িয়া, চিঠি অপহরণ করিয়া, গ্রাম লুঠিয়া কখনো বা সৈন্য চালনা করিতেছেন, কখনো বা পরাজিত হইয়া পলাইতেছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছে না।’ এই অসামান্য বীর যখন পারোনের জঙ্গলের মধ্যে ঘুমাইতেছিলেন, তখন মানসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। গুরুভার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, সৈনিক-বিচারালয়ে আহূত হইয়া তিনি ফাঁসি কাষ্ঠে আরোহণ করিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রকৃতি নির্ভীক ও প্রশান্ত ছিল। তিনি বিচারের প্রার্থনা করেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন যে, “আমি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের হস্তে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কিছুই আশা করি না। কেবল এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমার প্রাণ-দণ্ড যেন শীঘ্রই সমাধা হয়, ও আমার জন্য যেন আমার নির্দোষী বন্দী পরিবারেরা কষ্ট ভোগ না করে।’

ইংরাজেরা যদি স্বার্থপর বণিক জাতি না হইতেন, যদি বীরত্বের প্রতি তাঁহাদের অকপট ভক্তি থাকিত, তবে হতভাগ্য বীরের এরূপ বন্দীভাবে অপরাধীর ন্যায় অপমানিত হইয়া মরিতে হইত না, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তর-মূর্তি এত দিনে ইংলন্ডের চিত্রশালায় শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইত। যে ঔদার্যের সহিত আলেক্‌জান্ডার পুরুরাজের ক্ষত্রিয়োচিত স্পর্ধা মার্জনা করিয়াছিলেন, সেই ঔদার্যের সহিত তাঁতিয়া টোপীকে ক্ষমা করিলে কি সভ্যতাভিমানী ইংরাজ জাতির পক্ষে আরও গৌরবের বিষয় হইত না? যাহা হউক ইংরাজেরা এই অসামান্য ভারতবর্ষীয় বীরের শোণিতে প্রতিহিংসারূপ পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন।

আমরা সিপাহি যুদ্ধ সময়ের আরও অনেক বীরের নামোল্লেখ করিতে পারি, যাঁহারা ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কবির সংগীতে, প্রস্তরের প্রতিমূর্তিতে, অভ্রভেদী স্মরণস্তম্ভে অমর হইয়া থাকিতেন। বৈদেশিকদের লিখিত ইতিহাসের একপ্রান্তে তাহাদের জীবনীর দুই-এক ছত্র অনাদরে লিখিত রহিয়াছে, ক্রমে ক্রমে কালের স্রোতে তাহাও ধৌত হইয়া যাইবে এবং আমাদের ভবিষ্যবংশীয়দের নিকট তাঁহাদের নাম পর্যন্ত অজ্ঞাত থাকিবে।

শঙ্করপুরের রাণা বেণীমাধু লর্ড ক্লাইভের আগমনে নিজ দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার ধন সম্পত্তি অনুচরবর্গ কামান ও অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যার বেগম ও বির্জিস্ কাদেরের সহিত যোগ দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকেই আপনার অধিপতি বলিয়া জানিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে রাজার ন্যায় মান্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন, তাঁহাকে মৃতু-দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রাজা সমুদয় প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া বেগম ও তাঁহার পুত্রের জন্য টেরাই প্রদেশে আশ্রয়হীন ও রাজ্যহীন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বেণীমাধু জীবনের বিনিময়েও তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই এবং ইংরাজদের হস্তে কোনো মতে আত্মসমর্পণ করেন নাই। রাজপুত বীর নহিলে আপনার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য কয়জন লোক এরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে পারে?

রয়ার রাজপুত অধিপতি, নৃপৎসিং খঞ্জ ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, “ঈশ্বর আমার একটি অঙ্গ লইয়াছেন, অবশিষ্ট অঙ্গগুলি আমার দেশের জন্য দান করিব।’

কিন্তু আমরা সর্বাপেক্ষা বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাইকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। তাঁহার যথার্থ ও বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর, অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাওয়া গেল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

লর্ড ড্যালহূসি ঝান্সী রাজ্য ইংরাজশাসনভুক্ত করিলেন, এবং ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাইয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া উপজীবিকাস্বরূপ যৎসামান্য বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। এই স্বল্প বৃত্তি রানীর সম্ভ্রম-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, এই নিমিত্ত তিনি প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, অবশেষে অগত্যা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না, লক্ষ্মীবাইয়ের মৃত স্বামীর যাহা-কিছু ঋণ ছিল তাহা রানীর জীবিকা হইতে পরিশোধ করিতে লাগিলেন। রানী ইহাতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্যে গো-হত্যা আরম্ভ করিল, ইহাতে রাজ্ঞী ও নগরবাসীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করিল কিন্তু তাহাও গ্রাহ্য হইল না।

এইরূপে রাজ্যহীনা, সম্পত্তিহীনা, অভিমানিনী রাজ্ঞী নিষ্ঠুর অপমানে মনে মনে প্রতিহিংসার অগ্নি পোষণ করিতে লাগিলেন এবং যেমন শুনিলেন কোম্পানির সৈনিকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, অমনি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য সুকুমার দেহ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক, তাঁহার দেহ যেমন বলিষ্ঠ মনও তেমনি দৃঢ় ছিল।

রাজ্ঞী অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। রাজ্যপালনের জটিল ব্যাপার সকল অতিসুন্দররূপে বুঝিতেন। ইংরাজ কর্মচারীগণ তাঁহাদের জাতিগত স্বভাব অনুসারে এই হৃতরাজ্য-রাজ্ঞীর চরিত্রে নানাবিধ কলঙ্ক আরোপ করিলেন, কিন্তু এখনকার ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে, তাহার এক বর্ণ সত্য নহে।

ঝান্‌সী নগরী অতিশয় পরিপাটী পরিচ্ছন্ন, উহা দৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের কুঞ্জ ও সরোবরে সেই-সকল প্রাচীরের চতুর্দিকে সুশোভিত ছিল। একটি উচ্চ শৈলের উপর দৃঢ়-দুর্গ-বদ্ধ রাজপ্রাসাদ দাঁড়াইয়া আছে। নগরীতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া অনেক ইংরাজ অধিবাসী সেখানে বাস করিত। কাপ্তেন ডান্‌লপের হস্তে ঝান্‌সী নগরীর রক্ষাভার ছিল। ভারতবর্ষে যখন বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে সতর্ক হইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু ঝান্‌সীর শান্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

এই প্রশান্ত ঝান্‌সিরাজ্যে বিধবা রাজ্ঞী ও তাঁহার ভৃত্যবর্গের উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে একটি বিষম বিপ্লব ধূমায়িত হইতেছিল। সহসা একদিন স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় নীরব ঝান্‌সি নগরীর মর্মস্থল হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্রাব উদ্‌গীরিত হইল।

প্রকাশ্য দিবালোকে কান্টনমেন্টের মধ্যে দুইটি ডাকবাঙলা বিদ্রোহীরা দগ্ধ করিয়া ফেলিল, যেখানে বারুদ ও ধনাগার রক্ষিত ছিল, সেখান হইতে বিদ্রোহীদিগের বন্দুক-ধ্বনি শ্রুত হইল, এক দল সিপাহি ওই দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তাহারা উহা কোনো মতে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল না। ইউরোপীয়েরা আপনাপন পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নগরী-দুর্গে আশ্রয় লইল। ক্রমে ক্রমে সৈন্যেরা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া অধিকাংশ ইংরাজ সেনানায়কদিগকে নিহত করিল। বিদ্রোহীগণ দুর্গে উপস্থিত হইল।

ক্যাপটেন ডান্‌লপ হিন্দু সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাহারা সেইখানেই তাঁহাকে বন্দুকে হত করিল। দুর্গস্থ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্নে বিদ্রোহী-সৈন্যেরা দুর্গের নিম্নঅংশ অধিকার করিয়া লইল। পরাজিত ইংরাজ সেনারা বিদ্রোহী সেনাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল, কিন্তু উন্মত্ত সৈন্যেরা তাহাদিগকে নিহত করিল। এই নিধন কার্যে রাজ্ঞীর কোনো হস্ত ছিল না, এমন-কি, এ সময়ে রাজ্ঞীর কোনো অনুচরও উপস্থিত ছিল না। যখন রাজ্যে একটিও ইংরাজ অবশিষ্ট রহিল না তখন রাজ্ঞী এই অন্যায়কারীদিগকেও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এক্ষণে কথা উঠিল,

কে রাজ্য অধিকার করিবে? রাজ্ঞী সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন; সদাশিব রাও নামে একজন ওই রাজ্যের প্রার্থী কুরারা দুর্গ অধিকার করিল। পরে রাজ্ঞীর সৈন্য-কর্তৃক তাড়িত হইয়া সিন্ধিয়া-রাজ্যে পলায়ন করিল। এইরূপে ইংরাজেরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হত ও তাড়িত হইলে পর ১৮৫৭ খৃ| অব্দে লক্ষ্মীবাই হৃত-সিংহাসনে পুনরায় আরোহণ করিলেন। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া লক্ষ্মীবাই ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে পুনরায় ইংরাজ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইংরাজ সেনানায়ক সার হিউ রোজ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে ঝান্‌সী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রস্তরময় নগর-প্রাচীরে ব্রিটিশ কামান গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। দুর্গস্থ লোকেরা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পুরমহিলাগণ দুর্গ-প্রাকার হইতে কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিল এবং সৈন্যদের খাদ্যাদি বণ্টন করিতে লাগিল, এবং সশস্ত্র ফকিরগণ নিশান হস্তে লইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

৩১ মার্চ রানী দেখিলেন, তাঁতিয়া টোপী ও বানপুরের রাজা অল্পসংখ্যক সৈন্যদল লইয়া ইংরাজ-শিবির-পার্শ্বে নিবেশ স্থাপন করিয়া সংকেত-অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন। হর্ষধ্বনি ও তোপের শব্দে ঝান্‌সীদুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার পর দিন ইংরাজ সৈন্যদের সহিত তাঁতিয়া টোপীর ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, এই যুদ্ধে তাঁতিয়া টোপীর ১৫০০ সৈন্য হত হইল এবং তিনি পরাজিত হইয়া বেটোয়ার পরপারে পলায়ন করিলেন।

যুদ্ধে প্রত্যহ রাজ্ঞীর ৫০/৬০ জন করিয়া লোক মরিতে লাগিল। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট কামানগুলির মুখ বন্ধ করা হইয়াছে এবং ভালো ভালো গোলন্দাজেরা হত হইয়াছে।

ক্রমে ইংরাজ সৈন্যেরা গোলার আঘাতে নগর প্রাচীর ভেদ করিল এবং প্রাসাদ ও নগরীর প্রধান প্রধান অংশ অধিকার করিল। প্রাসাদের মধ্যে ঘোরতর সম্মুখযুদ্ধ বাধিল। রানীর শরীর-রক্ষকদের মধ্যে ৪০ জন অশ্বশালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। আহত সৈন্যেরা মুমূর্ষু অবস্থাতেও ভূতলে পড়িয়া অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল।

একে একে ৩৯ জন হত হইলে অবশিষ্ট এক জন বারুদে আগুন লাগাইয়া দিল, আপনি উড়িয়া গেল ও অনেক ইংরাজ সৈন্যও সেইসঙ্গে হত হইল।

রাত্রেই রাজ্ঞী কতকগুলি অনুচরের সহিত দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, শত্রুরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল এবং আর একটু হইলেই তাঁহাকে ধরিতে সক্ষম হইত। লেপ্টনেন্ট বাউকর অশ্বারোহী সৈন্যদলের সহিত ঝান্‌সী হইতে দশ ক্রোশ পর্যন্ত রাজ্ঞীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে দেখিলেন অশ্বারোহী লক্ষ্মীবাই চারি জন অনুচরের সহিত গমন করিতেছেন। বহুসৈন্যবেষ্টিত বাউকর এই চারি জন অশ্বারোহী-কর্তৃক এমন আহত হইলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই সময়ে তাঁতিয়া টোপী কতকগুলি সৈন্য লইয়া রানীর রক্ষক হইলেন।

৪ এপ্রিলে ইংরাজরা সমস্ত ঝান্‌সী নগরী অধিকার করিয়া লইল। সৈনিকেরা নগরে দারুণ হত্যা আরম্ভ করিল, কিন্তু নগরবাসীরা কিছুতেই নত হইল না। পাঁচ সহস্রের অধিক লোক ব্রিটিশ বেয়নেটে বিদ্ধ হইয়া নিহত হইল। নগরবাসীরা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করা অপমান ভাবিয়া স্বহস্তে মরিতে লাগিল। অসভ্য ইংরাজ সৈনিকেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবে জানিয়া পৌরজনেরা স্বহস্তে স্ত্রী-কন্যাগণকে বিনষ্ট করিয়া মরিতে লাগিল।

রাও সাহেব পেশোয়া বংশের শেষ বাজিরাওয়ের দ্বিতীয় পোষ্য পুত্র। তিনি, তাঁতিয়া টোপী ও ঝান্‌সীরানী বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য কুঞ্চ নগরে সৈন্য স্থাপন করিলেন। অবিরল কামান বর্ষণ করিয়া হিউ রোজ তাঁহাদের তাড়াইয়া দিল। চারিক্রোশ রানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়না করিয়া সেনাপতি চারিবার ঘোড়ার উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অবশেষে লক্ষ্মীবাই কাল্পীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার এই শেষ অস্ত্রাগার রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। মনে করিয়াছিলেন রাজপুতেরা যোগ

দিবে, কিন্তু তাহারা দিল না। ব্রিটিশ সৈন্যেরা একত্র হইয়া আক্রমণ করিল, অদৃঢ়দুর্গ কাল্পীতে রাজ্ঞীর সৈন্য আর তিষ্ঠিতে পারিল না।

কুঞ্চের পরাজয়ের পর তাঁতিয়া টোপী যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন কেহ জানিতে পারিল না। তিনি এখন গোয়ালিয়রের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে ইংরাজদের মিত্ররাজা সিন্ধিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁতিয়া টোপী অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে অনেকটা কৃতকার্য হইলে পর রাজ্ঞীকে সংবাদ দিলেন। রাজ্ঞী গোপালপুর হইতে রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা রাজার সহিত শত্রুতা করিতে যাইতেছেন না, তবে কিছু অর্থ ও খাদ্যাদি পাইলেই তাঁহারা দক্ষিণে চলিয়া যাইবেন, রাজা তাহাদের যেন বাধা না দেন, কারণ বাধা দেওয়া অনর্থক। গোয়ালিয়রের লোকেরা ইংরাজ-বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছে। তাঁহারা তাহাদের নিকট হইতে দুইশত আহ্বান-পত্র পাইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজভক্ত সিন্ধিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন।

রাও ও রানী দৃঢ়স্বরে তাঁহাদের অনুচরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আমরা বোধ হয় নাগরিকদের নিকট হইতে কোনো বাধা প্রাপ্ত হইব না, যদি বা পাই তবে তোমাদের ইচ্ছা হয় তো পলাইয়ো, কিন্তু আমরা মরিতে প্রস্তুত হইয়াছি।’

১ জুনে সিন্ধিয়া ৮০০০ লোক ও ২৪টি কামান লইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার সৈন্যদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সিন্ধিয়া তাঁহার শরীর-রক্ষকদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইলেন কিন্তু তাহারা হত ও আহত হইল। সিন্ধিয়া অশ্বারোহণে আগ্রার দিকে পলায়ন করিলেন। মহারানীর মাতা “গুজ্জারাজা’ সিন্ধিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন মনে করিয়া, কৃপাণ লইয়া অশ্বারোহণে তাঁহাকে মুক্ত করিতে গেলেন; অবশেষে সিন্ধিয়া পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ঝান্‌সীরাজ্ঞীর সৈন্যগণ সিন্ধিয়ার রাজকোষ হস্তগত করিল, এবং তাহা হইতে রানী সৈন্যদের ছয় মাসের বেতন চুকাইয়া দিলেন ও নগরবাসীদিগকে পুরস্কার দানে সন্তুষ্ট করিলেন। কিন্তু তাঁতিয়া টোপী ও রাজ্ঞী দুর্গরক্ষার কিছুমাত্র আয়োজন করেন নাই; তাঁহারা

প্রকাশ্য ক্ষেত্রেই সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন; সমুদয় বন্দোবস্ত রানী একাকীই সম্পন্ন করিতেছিলেন। তিনি সৈনিকের বেশ পরিয়া, যে রৌদ্রে ইংরাজ-সেনাপতি চারিবার মূর্ছিত হইয়া পড়েন, সেই রৌদ্রে অপরিশ্রান্ত ভাবে মুহূর্ত বিশ্রাম না করিয়া অশ্বারোহণে এখানে ওখানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

সার হিউ রোজ যখন শুনিলেন যে, গোয়ালিয়র শত্রুগস্তগত হইয়াছে, তখন সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া রাজ্ঞী-সৈন্যের দুর্বলভাগ আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধের দরুন বিপ্লবের মধ্যে রাজ্ঞী অসি হস্তে ইতস্তত অশ্বচালনা করিতেছেন। রাজ্ঞীর সৈন্যরা ভঙ্গ দিল; বিপক্ষ সৈন্যদের গুলিতে রাজ্ঞী অত্যন্ত আহত হইলেন। তাঁহার অশ্ব সম্মুখে একটি খাত দেখিয়া কোনোমতে উহা উল্লঙ্ঘন করিতে চাহিল না; লক্ষ্মীবাইয়ের স্কন্ধে বিপক্ষের তলবারের আঘাত লাগিল, তথাপি তিনি অশ্বপরিচালনা করিলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী ভগিনীর মস্তকে তলবারের আঘাত লাগিল এবং উভয়ে পাশাপাশি রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। এই ভগিনী যুদ্ধের সময়ে কোনো ক্রমে রাজ্ঞীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই, অবিশ্রান্ত তাঁহারই সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ বলে যে, তিনি রাজ্ঞীর ভগিনী নহেন, তিনি তাঁহার স্বামীর উপপত্নী ছিলেন।

ইংরাজি ইতিহাস হইতে আমরা রাজ্ঞীর এইটুকু জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা নিজে তাঁহার যেরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১২৮৪

কাজের লোক কে

আজ প্রায় চারশো বৎসর হইল পঞ্জাবে তলবন্দী গ্রামে কালু বলিয়া একজন ক্ষত্রিয় ব্যাবসা-বাণিজ্য করিয়া খাইত। তাহার এক ছেলে নানক। নানক কিছু নিতান্ত ছেলেমানুষ নহে। তাহার বয়স হইয়াছে, এখন কোথায় সে বাপের ব্যাবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করিবে তাহা নহে- সে আপনার ভাবনা লইয়া দিন কাটায়, সে ধর্মের কথা লইয়াই থাকে।

কিন্তু বাপের মন টাকার দিকে, ছেলের মন ধর্মের দিকে- সুতরাং বাপের বিশ্বাস হইল এ ছেলেটার দ্বারা পৃথিবীর কোনো কাজ হইবে না। ছেলের দুর্দশার কথা ভাবিয়া কালুর রাত্রে ঘুম হইত না। নানকেরও যে রাত্রে ভালো ঘুম হইত তাহা নহে, তাহারও দিনরাত্রি একটা ভাবনা লাগিয়া ছিল।

বাবা যদিও বলিতেন ছেলের কিছু হইবে না, কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাহা বলিত না। তাহার একটা কারণ বোধ করি এই হইবে যে, নানকের ধর্মে মন থাকাতে পাড়ার লোকের বাণিজ্য-ব্যাবসার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু বোধ করি তাহারা, নানকের চেহারা, নানকের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিল। এমন-কি, নানকের নামে একটা গল্প রাষ্ট্র আছে। গল্পটা যে সত্য নয় সে আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে, লোকে যেরূপ বলে তাহাই লিখিতেছি। একদিন নানক মাঠে গোরু চরাইতে গিয়া গাছের তলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য অস্ত যাইবার সময় নানকের মুখে রোদ লাগিতেছিল। শুনা যায় নাকি একটা কালো সাপ নানকের মুখের উপর ফণা ধরিয়া রোদ আড়াল করিয়াছিল। সে দেশের রাজা সে সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা রাজার নিজের মুখে এ কথা শুনি নাই, নানকও কখনো এ গল্প করেন নাই, এবং এমন পরোপকারী সাপের কথাও কখনো শুনি নাই–শুনিলেও বড়ো বিশ্বাস হয় না।

কালু অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, নানক যদি নিজের হাতে ব্যবসা আরম্ভ করেন তবে ক্রমে কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি নানকের হাতে কিছু টাকা দিলেন; বলিয়া দিলেন, “এক গাঁয়ে লুন কিনিয়া আর-এক গাঁয়ে বিক্রয় করিয়া আইস।’ নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু চাকরকে সঙ্গে করিয়া লুন কিনিতে গেলেন। এমন সময়ে পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে নানকের দেখা হইল। নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন, এই ফকিরদের কাছে ধর্মের বিষয় জানিয়া লইবেন। কিন্তু কাছে গিয়া যখন তাহাদিগকে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাহারা কথার উত্তর দিতে পারে না। তিন দিন তাহারা খাইতে পায় নাই, এমনি দুর্বল হইয়া গিয়াছে যে মুখ দিয়া কথা সরে না। নানকের মনে বড়ো দয়া হইল। তিনি কাতর হইয়া তাঁহার চাকরকে বলিলেন, “আমার বাপ কিছু লাভের জন্য আমাকে লুনের ব্যবসা করিতে হুকুম করিয়াছেন। কিন্তু এ লাভের টাকা কতদিনই বা থাকিবে! দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে। আমার বড়ো ইচ্ছা হইতেছে এই টাকায় এই গরিবদের দুঃখ মোচন করিয়া যে লাভ চিরদিন থাকিবে সেই পুণ্য লাভ করি।’ বালসিন্ধু কাজের লোক ছিল বটে, কিন্তু নানকের কথা শুনিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সে কহিল, “এ বড়ো ভালো কথা।’ নানক তাঁহার ব্যাবসার সমস্ত টাকা ফকিরদের দান করিলেন। তাহারা পেট ভরিয়া খাইয়া যখন গায়ে জোর পাইল তখন নানককে ডাকিয়া ঈশ্বরের কথা শুনাইল। তাহারা নানককে বুঝাইয়া দিল, ঈশ্বর কেবল একমাত্র আছেন আর সমস্ত তাঁহারই সৃষ্টি। এই-সকল কথা শুনিয়া নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল।

তাহার পরদিন নানক বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। কালু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কত লাভ করিলে?’ নানক বলিল, “বাবা, আমি গরিবদের খাওয়াইয়াছি। তোমার এমন ধনলাভ হইয়াছে যাহা চিরকাল থাকিবে!’ কিন্তু সেরূপ ধনের প্রতি কালুর বড়ো একটা লোভ ছিল না। সুতরাং সে রাগিয়া ছেলেকে মারিতে লাগিল। এমন সময়ে সে প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নাম রায়বোলার। নানককে মারিতে দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী হইয়াছে? এত গোল কেন?’ যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন তখন তিনি কালুকে খুব করিয়া তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, “আর যদি কখনো

নানকের গায়ে হাত তোল তো দেখিতে পাইবে।’ এমন-কি, রাজা অত্যন্ত ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিলেন। লোকে বলে যে, যখন সাপ নানককে ছাতা ধরিয়াছিল তখন রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন, এইজন্যই নানকের উপর তাঁহার এত ভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে সাপের ছাতা- ধরা সমস্তই গুজব; আসল কথা, নানকের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নানক একজন মস্তলোক।

নানকের উপর আর তো মারধোর চলে না। কালু অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন।

জয়রাম নানকের ভগিনীপতি। পাঠান দৌলতখাঁর শস্যের গোলা জয়রামের জিম্মায় ছিল। কালু স্থির করিলেন, নানককেও জয়রামের কাজে লাগাইয়া দিবেন, তাহা হইলে ক্রমে নানক কাজের লোক হইয়া উঠিবেন। নানকের বাপ যখন নানকের কাছে এই প্রস্তাব করিলেন তখন তিনি বলিলেন, “আচ্ছা।’ এই বলিয়া নানক সুলতানপুরে জয়রামের কাছে গিয়া উপস্থিত। সেখানে দিনকতক বেশ কাজ করিতে লাগিলেন। সকলের ‘পরেই তাঁহার ভালোবাসা ছিল, এইজন্য সুলতানপুরের সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিতে লাগিল। কিন্তু কাজে মন দিয়া নানক তাঁহার আসল কাজটি ভুলেন নাই। তিনি ঈশ্বরের কথা সর্বদাই ভাবিতেন।

এমন কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদিন সকালে নানক একলা বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে বলিল, “নানক, তুমি আজকাল কী লইয়া আছ বলো দেখি। এ-সকল কাজকর্ম ছাড়িয়া দাও। চিরদিনের যথার্থ ধন তাহাই উপার্জনের চেষ্টা করো।’ ফকির যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, ধর্ম উপার্জন করো, পরের উপকার করো, পৃথিবীর ভালো করো, ঈশ্বরে মন দাও- টাকা রোজগার করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার চেয়ে ইহাতে বেশি কাজ দেবে।

ফকিরের এই কথাটা হঠাৎ এমনি নানকের মনে লাগিল যে তিনি চমকিয়া উঠিলেন, ফকিরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন ও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্ছা ভাঙিতেই

তিনি গরিব লোকদিগকে ডাকিলেন ও শস্য যাহা-কিছু ছিল সমস্ত তাহাদিগকে বিলাইয়া দিলেন। নানক আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না; কাজকর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তিনি পলাইয়া গেলেন।

নানক পলাইলেন বটে কিন্তু অনেক লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। যাঁহার ধর্মের দিকে এত টান, এমন মধুর ভাব, এমন মহৎ স্বভাব, তিনি সকলকে ছাড়িলেও তাঁহাকে সকলে ছাড়ে না। মর্দানা তাঁহার সঙ্গে গেল; সে ব্যক্তি বীণা বাজাইত, গান গাহিত। লেনা তাঁহার সঙ্গে গেল। সেই-যে পুরানো চাকর বালসিন্ধু ছেলেবেলায় নানকের সঙ্গে লুন বিক্রয় করিয়া টাকা লাভ করিতে গিয়াছিল আজও সে নানকের সঙ্গে চলিল; এবারেও বোধ করি কিঞ্চিৎ ধনলাভের আশা ছিল, কিন্তু যে-সে ধন নয়, সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন সেই ধর্ম। রামদাসও নানককে ছাড়িতে পারিল না; তাহার বয়স বেশি হইয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাকে বলিত বুড্‌ঢা। আর কত নাম করিব, এমন ঢের লোক সঙ্গে গেল।

নানক যথাসাধ্য সকলের উপকার করিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি ভালোবাসিতেন। হিন্দুধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন, মুসলমান ধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন। অথচ হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। নানক আমাদের বাংলাদেশেও আসিয়াছিলেন। শিবনাভু বলিয়া কোন্‌-এক দেশের রাজা নানা লোভ দেখাইয়া নানককে উচ্ছন্ন দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক তাহাতে ভুলিবেন কেন? উল্‌টিয়া রাজাকে তিনি ধর্মের দিকে লওয়াইলেন। মোগল সম্রাট বাবরের সঙ্গে একবার নানকের দেখা হয়। সম্রাট নানকের সাধুভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নানক তাহা লইলেন না; তিনি বলিলেন, “যে জগদীশ্বর সকল লোককে অন্ন দিতেছেন, অনুগ্রহ ও পুরস্কার আমি তাঁহারই কাছ হইতে চাই, আর কাহারো কাছে চাই না।’ নানক যখন মক্কায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন তখন একদিন তিনি মসজিদের দিকে পা করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাহাই দেখিয়া একজন মুসলমানের বড়ো রাগ হইল। সে তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল, “তুমি কেমন লোক হে! ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে পা করিয়া

তুমি ঘুমাইতেছ!’ নানক বলিলেন, “আচ্ছা ভাই, জগতের কোন্ দিকে ঈশ্বরের মন্দির নাই একবার দেখাইয়া দাও!’ নানক লোক ভুলাইবার জন্য কোনো আশ্চর্য কৌশল দেখাইয়া কখনো আপনাকে মস্ত লোক বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন নাই। গল্প আছে একবার কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, “আচ্ছা, তুমি যে একজন মস্ত সাধু, আমাদিগকে একটা কোনো আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা দেখাও দেখি।’ নানক বলিলেন, “তোমাদিগকে দেখাইবার যোগ্য আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল পবিত্র ধর্মের কথা জানি, আর কিছুই জানি না। ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অস্থায়ী।’

নানক অনেক দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থ হইলেন। গৃহে থাকিয়া তিনি সকলকে ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি কোরান পুরাণ কিছুই মানিতেন না। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন, এক ঈশ্বরকে পূজা করো, ধর্মে মন দাও, অন্য সকলের দোষ মার্জনা করো, সকলকে ভালোবাসো। এইরূপ সমস্ত জীবন ধর্মপথে থাকিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া সত্তর বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়।

কালু বেশি কাজের লোক ছিল কি কালুর ছেলে নানক বেশি কাজের লোক ছিল আজ তাহার হিসাব করিয়া দেখো দেখি! আজ যে শিখ জাতি দেখিতেছ, যাহাদের সুন্দর আকৃতি, মহৎ মুখশ্রী, বিপুল বল, অসীম সাহস দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়, এই শিখ জাতি নানকের শিষ্য। নানকের পূর্বে এই শিখ জাতি ছিল না। নানকের মহৎ ভাব ও ধর্মবল পাইয়া এমন একটি মহৎ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। নানকের ধর্মশিক্ষার প্রভাবেই ইহাদের হৃদয়ে তেজ বাড়িয়াছে, ইহাদের শির উন্নত হইয়াছে, ইহাদের চরিত্রে ও ইহাদের মুখে মহৎ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালু যে টাকা রোজগার করিয়াছিল নিজের উদরেই তাহা খরচ করিয়াছে, আর নানক যে ধর্মধন উপার্জন করিয়াছিলেন আজ চারশো বৎসর ধরিয়া মানবেরা তাহা ভোগ করিতেছে। কে বেশি কাজ করিয়াছে!

বালক, বৈশাখ, ১২৯২

গুটিকত গল্প

১

নেপালিয়ন বোনাপার্টের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তিনি এক সময়ে ইংরাজের দেশ আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। যখন যুদ্ধের উদ্‌যোগ চলিতেছে তখন কী-গতিকে একজন ইংরাজি জাহাজের গোরা ফরাসি সৈন্যদের কাছে ধরা পড়ে। শত্রুপক্ষের লোক দেখিয়া ফরাসিরা তাহাকে নিজের দেশে ধরিয়া আনিয়া সমুদ্রের ধারে ছাড়িয়া দেয়। সে বেচারা একা একা সমুদ্রের ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত। দেশে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিত। সমুদ্রের পরপারেই তার স্বদেশ। সে সমুদ্রও কিছু বেশি বড়ো নয়। এমন-কি, এক-এক দিন হয়তো মেঘ কাটিয়া গেলে রোদ উঠিলে ইংলন্ডের সাদা সাদা পাহাড়ের রেখা নীল-সমুদ্রের উপর মেঘের মতো দেখা যাইত। সে আকাশে চাহিয়া দেখিত, গরমির দিনে কত ছোটো ছোটো পাখি পাখা তুলিয়া ইংলন্ডের দিকে উড়িয়া যাইতেছে।

একদিন রাত্রে ঝড় হইয়া গেলে পর সকালে উঠিয়া দেখে একটি পিপে সমুদ্রের ঢেউয়ে ডাঙার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। সেই পিপেটি লইয়া সে একটি পাহাড়ের গর্তের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। সমস্তদিন ধরিয়া বসিয়া বসিয়া সেই পিপেটি ভাঙিয়া সে নৌকা বানাইত। কিন্তু সে গরিব- নৌকা বানাইবার সরঞ্জাম কোথায় পাইবে? সে সেই ভাঙা পিপের কাঠের চারি দিকে নরম গাছের ডাল বুনিয়া একপ্রকার নৌকার মতো গড়িয়া তুলিল। দেশের জন্য এমনি তাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে যে সে একবার বিবেচনা করিল না যে এ নৌকা সমুদ্রের জলে একদণ্ড টিকিতে পারিবে না। যাহা হউক, সেই নৌকাটি লইয়া যখন সে সমুদ্রে ভাসাইতেছে, এমন সময় ফরাসি সৈন্যেরা তাহাকে দেখিতে পাইল। ফরাসিরা তাহাকে ধরিল। বেচারার এত কষ্টের নৌকা ভাসানো হইল না- এতদিনের আশা নির্মূল হইল।

এই কথা কী করিয়া নেপোলিয়নের কানে উঠিল। নেপোলিয়ন সমুদ্রের ধারে গিয়া সমস্ত দেখিলেন। তিনি সেই ইংরাজ বালককে বলিলেন– “তোমার এ কী রকম সাহস! এই খানকতক কাঠ আর গাছের ডাল বেঁধে তুমি সমুদ্র পার হতে চাও! দেশে তোমার কেই বা আছে!’

সেই ইংরাজ বলিল– “আমার মা আছে। আমার মাকে অনেক দিন দেখি নাই, মাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ো ব্যাকুল হইয়াছে।’ বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল।

নেপোলিয়ন তৎক্ষণাৎ বলিলেন– “আচ্ছা– মায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, আমি দেখা করিয়ে দেব। যে ছেলে এমন সাহসী তাহার মা না-জানি কত মহৎ। ’

নেপোলিয়ন তাহাকে একটি মোহর দিলেন– এবং নিজের জাহাজে করিয়া তাহাকে ইংলন্ডে পাঠাইয়া দিলেন। দুঃখে পড়িলেও সেই মোহরটি সে কখনো ভাঙায় নাই, নেপোলিয়নের দয়া মনে রাখিবার জন্য সেই মোহরটি সে চিরদিন কাছে রাখিয়াছিল।

২

একশো বৎসরেরও অধিক হইল একদিন জর্মনির একটি ছোটো প্রদেশের চার্লস্ নামে এক রাজা আহার করিয়া উঠিয়া আসিতেছেন এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন তাঁহার রাজবাটির সম্মুখে একদল লোক জমা হইয়াছে। বাটির বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একদল ছেলে। কী, ব্যাপারটা কী? রাজার নিকট একটি নিবেদন আছে। রাজার সহিসের ছেলে ডানেকর, পায়ে জুতা নাই, গায়ে ময়লা কাপড়– সে অগ্রসর হইয়া আপনাদের প্রার্থনা রাজাকে জানাইল। রাজার একটি স্কুল আছে, কেবল তাঁহার সৈন্যেরা সেই স্কুলে পড়ে। সম্প্রতি শুনা গেছে রাজা নিয়ম করিয়াছেন অন্য ছেলেরাও সেখানে পড়িতে পাইবে, তাই শুনিয়া রাজার সেই স্কুলে ভর্তি হইবার জন্য ইহারা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে।

সহিসের ছেলে ডানেকর ছবি আঁকিতে বড়ো ভালোবাসিত। সে মাটিতে দেয়ালে যেখানে পাইত খড়ি দিয়া নানারকম ছবি আঁকিত। সে জানিত রাজার স্কুলে ছবি আঁকা শিখানো হয়। তাই যখন সে শুনিল রাজার স্কুলে সকলেই যাইতে পারে তখন ভারি খুশি হইয়া সেই স্কুলে ভর্তি হইবার জন্য বাপের কাছে প্রস্তাব করে। বাপ চটিয়া গরম হইয়া উঠিল- বলিল, “তুমি নিজের কাজে মন দাও তো বাপু। লেখাপড়া শিখিতে হইবে না!’ এই বলিয়া তাহাকে মারিয়া ঘরে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিল। ডানেকর জানালার মধ্য দিয়া গলিয়া আপনার সমবয়সী একদল ছোটো ছেলে জুটাইয়া স্বয়ং রাজার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ডানেকরকে স্কুলে পাঠাইতে রাজি হইলেন। ডানেকরের বাপ দেখিল ছেলে স্কুলে গেলে আস্তাবলের কাজের কিছু অসুবিধা হইবে- ভারি বিরক্ত হইয়া মারধোর করিয়া ছেলেকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিল। কিন্তু ছেলের মা গুটিকতক গায়ের কাপড় পুঁটুলিতে বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে দিলেন- এবং খানিক রাস্তা তাহার সঙ্গে গিয়া ছেলের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ডানেকর গরিব- এইজন্য স্কুলে তাহাকে কেহ গ্রাহ্য করিত না। সেখানে তাহাকে উঠান ঝাঁট দিতে হইত, চাকরের কাজ করিতে হইত। বোধ করি যত্ন করিয়া তাহাকে কেহ শিখাইত না- অনেক সময়ে ডানেকর লুকাইয়া গোপনে শিক্ষা করিত। স্কুলে ছবি-আঁকা শেখা ফুরাইলে পর, আরও বেশি করিয়া শিখিবার জন্য ডানেকর পায়ে হাঁটিয়া দেশে বিদেশে ভ্রমণ করেন। এমনি করিয়া প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল।

এখন এই ডানেকরের নাম য়ুরোপে সকল জায়গায় বিখ্যাত। ডানেকরের মতো পাথরের মূর্তি গড়িতে কয়জন লোক পারে! যে রাজার স্কুলে তিনি পড়িতে অনুমতি পাইয়াছিলেন, সেই রাজার নাম আজ আর বড়ো কাহারো মনে পড়ে না, কিন্তু সেই রাজার একজন সহিসের ছেলের নাম য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্র হইতেছে!

৩

মাড়োয়ারের রাজপুত রাজা যশোবন্ত দিল্লির বাদশা আরঞ্জীবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অধীনে নহর খাঁ নামক এক হিন্দু রাজপুত বীর ছিলেন। নহর খাঁ বলিয়া তাহাকে সকলে ডাকিত বটে কিন্তু তাঁহার আসল নাম ছিল মুকুন্দদাস। এক সময়ে তিনি বাদশাকে অমান্য করাতে বাদশা তাঁহার উপর চটিয়া যান। বাদশা হুকুম দিলেন– “কোনো প্রকার অস্ত্র না লইয়া মুকুন্দকে একটা বাঘের খাঁচার মধ্যে গিয়া বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে।’ মুকুন্দ বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে।’ নির্ভয়ে খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বাঘকে ডাকিয়া বলিলেন– “ওহে তুমি তো মিঞা সাহেবের বাঘ, একবার যশোবন্তের বাঘের কাছে এসো দেখি!’ এই বলিয়া চোখ রাঙাইয়া তিনি বাঘের দিকে চাহিলেন। হঠাৎ কী কারণে বাঘের এমনি ভয় হইল যে, সে মুখ ফিরাইয়া লেজ গুটাইয়া সুড়সুড় করিয়া কোণে চলিয়া গেল। রাজপুত বীর কহিলেন, “যে-শত্রু ভয়ে পালায় তাহাকে তো আমরা মারিতে পারি না। তাহা আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ।’ এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া বাদশা তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

বাঘেরা অত্যন্ত ভয়ানক জানোয়ার বটে কিন্তু এক-এক সময়ে তাহারা হঠাৎ অত্যন্ত সামান্য কারণে কেমন ভয় পায়। একটা গল্প বোধ করি তোমরা সকলে শুনিয়া থাকিবে– একদল ইংরাজ সুন্দরবনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। যখন আহারের সময় হইল, বনের মধ্যে আসন পাতিয়া সকলে আহারে বসিয়া গেলেন। এমন সময়ে জঙ্গলের ভিতর হইতে একটা বাঘ লাফ দিয়া তাঁহাদের কাছে আসিয়া পড়িল। বাঘ দেখিয়া একটি মেমসাহেব তাড়াতাড়ি ছাতা খুলিয়া তাহার মুখের সামনে ধরিলেন। হঠাৎ অদ্ভুত একটা ছাতা-খোলার ব্যাপার দেখিয়া বাঘের এমনি ভয় লাগিল যে সেখানে অধিকক্ষণ থাকা সে ভালো বোধ করিল না, চটপট ঘরে ফিরিয়া গেল। এমন শোনা যায় বাঘের চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে বাঘ আক্রমণ করিতে সাহস করে না। এটা লোকের মুখে শোনা কথা। কথাটার সত্যমিথ্যা ঠিক বলিতে পারি না। নিজে পরখ করিয়া যে বলিব এমন সুবিধাও নাই সাধও নাই। পরখ করিতে গেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিবার সাবকাশ না থাকিতে পারে।

নহর খাঁর আর-একটা গল্প বলি। রাজপুতদের একপ্রকার খেলা আছে। ঘোড়ায় চড়িয়া একটা গাছের নীচে দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিতে হয়। ঘোড়া যখন ছুটিতেছে তখন গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে হয়, ঘোড়া পায়ের নীচে দিয়া চলিয়া যায়। বাদশাহের এক ছেলে একবার নহর খাঁকে এই খেলা খেলিতে হুকুম করেন। নহর রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, “আমি তো আর বাঁদর নই। রাজা যদি খেলা দেখিতে ইচ্ছা করেন তো লড়াই করিতে হুকুম দিন একবার তলোয়ারের খেলাটা দেখাইয়া দিই।’ বাদশার পুত্র বলিলেন– “আচ্ছা, তুমি সৈন্য লইয়া সিরোহীর রাজা সুরতানকে ধরিয়া লইয়া আইস।’ নহর রাজি হইলেন। সিরোহীর রাজা অচলগড় নামক তাঁর এক পর্বতের দুর্গের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। নহর বাছা-বাছা একদল লোক লইয়া গভীর রাত্রে গোপনে দুর্গের মধ্যে গিয়া রাজাকে নিজের পাগড়ির কাপড়ে বাঁধিয়া ফেলিলেন। রাজাকে এইরূপে বন্দী করিয়া নহর তাঁহাকে দিল্লীতে নিজের প্রভু যশোবন্ত সিংহের নিকট আনিয়া দিলেন। যশোবন্ত সুরতানকে বাদশার সভায়| লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন এবং সেইসঙ্গে কথা দিলেন যে বাদশাহের সভায় কেহ তাঁহাকে কোনোরূপ অপমান করিতে পারিবে না। সিরোহীর রাজাকে আরঞ্জীবের সভায় লইয়া যাওয়া হইল। দস্তুর আছে যে বাদশাহের সভায় গেলে বাদশাহকে সকলেরই নত হইয়া সেলাম করিতে হয়। সেই দস্তুর অনুসারে সকলে সুরতানকে সেলাম করিতে বলিল। তিনি সদর্পে মাথা তুলিয়া বলিলেন– “আমার প্রাণ বাদশাহের হাতে– কিন্তু আমার মান আমার নিজের হাতে। কখনো কোনো মানুষের কাছে মাথা নোয়াই নাই কখনো নোয়াইব না।’ সভার লোকেরা আশ্চর্য হইয়া গেল। কিন্তু যশোবন্তের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কেহ তাঁহাকে কিছু বলিল না। তাহারা একটা কৌশল করিল। একটি ছোটো দরজার মতো ছিল তাহার মধ্য দিয়া গলিতে হইলে মাথা নীচু না করিলে চলে না– সেই দরজার ভিতর দিয়া তাঁহাকে বাদশাহের সম্মুখে যাইতে বলিল। কিন্তু পাছে মাথা হেঁট হয় বলিয়া তিনি আগে পা গলাইয়া দিয়া মাথা বাহির করিয়া আনিলেন। বাদশাহ রাজার এই নির্ভীকতায় রাগ না করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “তুমি কোন্ রাজ্য পুরস্কার চাও আমি দিব।’ রাজা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “আমার অচলগড়ের মতো রাজ্য আর কোথায় আছে, সেইখানেই আমাকে ফিরিয়া যাইতে দিন।’ বাদশাহ

সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই অনুমতি করিলেন। এই রাজা এবং রাজবংশ চিরদিন আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কখনোই মোগল সম্রাটদের দাস হন নাই। যিনি বন্দী অবস্থাতেও নিজের মান রাখিয়া চলিতে পারেন তাঁহাকে দমন করিতে পারে কে?

বালক, বৈশাখ, ১২৯২

আকবর শাহের উদারতা

একজন প্রাচীন ইংরাজ ভ্রমণকারী আকবর বাদশাহের উদারতা সম্বন্ধে একটি গল্প করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

আকবর শাহের মাতৃভক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। এমন-কি, এক সময়ে যখন তাঁহার মা পালকি চড়িয়া লাহোর হইতে আগ্রায় যাইতেছিলেন, তখন আকবর এবং তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য বড়ো বড়ো ওমরাওগণ নিজের কাঁধে পালকি লইয়া তাঁহাকে নদী পার করিয়াছিলেন। সম্রাটের মা সম্রাটকে যাহা বলিতেন তিনি তাহাই পালন করিতেন। কেবল আকবর শা মায়ের একটি আজ্ঞা পালন করেন নাই। সম্রাটের মা সংবাদ পাইয়াছিলেন যে পর্টুগিজ নাবিকগণ একটি মুসলমান জাহাজ লুঠ করিয়া একখণ্ড কোরান গ্রন্থ পাইয়াছিল, তাহারা সেই গ্রন্থ একটি কুকুরের গলায় বাঁধিয়া বাজনা বাজাইয়া অর্মজ শহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাটমাতা আকবরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে একখণ্ড বাইবেল গাধার গলায় বাঁধিয়া আগ্রা শহর ঘোরানো হউক। সম্রাট তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন– “যে কার্য একদল পর্টুগালবাসীর পক্ষেই নিন্দনীয় সে কার্য একজন সম্রাটের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নাই। কোনো ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলে ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়। অতএব আমি একখানা নিরীহ গ্রন্থের উপর দিয়া প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করিতে পারিব না।’

বালক, আষাঢ়, ১২৯২

ন্যায় ধর্ম

প্রুসিয়ার “মহৎ’ উপাধিপ্রাপ্ত ফ্রেড্‌রিক সম্রাট রাজধানী হইতে কিছু দূরে একটি বাগানবাড়ি নির্মাণের সংকল্প করিয়াছিলেন। যখন সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল তখন শুনিতে পাইলেন যে, একজন কৃষকের একটি শস্য চূর্ণ করিবার জাঁতাকলগৃহ মাঝে পড়াতে তাঁহার বাগান সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। বিস্তর টাকার প্রলোভনেও কৃষক তাহার গৃহ উঠাইয়া লইতে রাজি হয় নাই শুনিয়া সম্রাট কৃষককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন– “তুমি এত টাকা পাইতেছ তবু কেন ঘর ছাড়িতেছ না?’ কৃষক উত্তর করিল– “ইহা আমার পৈতৃক গৃহ। ওইখানেই আমার পিতা তাঁহার জীবন নির্বাহ করিয়াছেন ও মরিয়াছেন, এবং ওইখানেই আমার পুত্রের জন্ম হইয়াছে, আমি উহা বেচিতে পারিব না।’

সম্রাট কহিলেন, “আমি ওই স্থানে আমার প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চাহি।’

কৃষক কহিল, “মহারাজ বোধ করি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ওই জাঁতাকলের ঘর আমার প্রাসাদ।’

সম্রাট কহিলেন– “তুমি যদি বিক্রয় না কর তো ওই গৃহ আমি কাড়িয়া লইতে পারি!’

কৃষক কহিল, “না, পারেন না। বার্লিন নগরে বিচারক আছে।’

এই কথা শুনিয়া সম্রাট কৃষকের ঘরে আর হস্তক্ষেপ করিলেন না। তিনি ভাবিলেন রাজারা আইন গড়িতে পারেন কিন্তু আইন ভাঙিতে পারেন না। কৃষকের সেই জাঁতাকল আজ পর্যন্ত সম্রাটের উদ্যানে রহিয়াছে।

গুজরাটের রানীর সম্বন্ধে এইরূপ আর-একটি গল্প প্রচলিত আছে। বহু পূর্বের কথা। তখন গুজরাট সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। রানীর নাম মীনল দেবী। তাঁহার রাজত্বকালে ধোলকা গ্রামে তিনি “মীনলতলাও’ নামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। ওই পুষ্করিণীর পূর্ব দিকে একটি দুশ্চরিত্রা রমণীর বাসগৃহ ছিল। সেই গৃহ থাকাতে পুষ্করিণীর আয়তনসামঞ্জস্যের ব্যাঘাত হইতেছিল। রানী অনেক অর্থ দিয়া সেই ঘর ক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রী মনে করিল, পুষ্করিণী খনন করাইয়া রানী যেরূপ কীর্তিলাভ করিবেন, পুষ্করিণী খননের ব্যাঘাত করিয়া আমারও তেমনি একটা নাম থাকিয়া যাইবে। এই বলিয়া সে গৃহ বিক্রয় করিতে অসম্মত হইল। রানী কিছুমাত্র বলপ্রয়োগ করিলেন না। গৃহ সেইখানেই রহিল। আজিও মীনলতলাওয়ের পূর্ব দিকের সীমা অসমান রহিয়াছে। সেই অবধি উক্ত প্রদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে, “ন্যায় ধর্ম দেখিতে চাও তো মীনলতলাও যাও।’

বালক, শ্রাবণ, ১২৯২

বীর গুরু

বনের একটা গাছে আগুন লাগিলে অন্যান্য যে-সকল গাছে উত্তাপ প্রচ্ছন্ন ছিল সেগুলাও যেমন আগুন হইয়া উঠে, তেমনি যে জাতির মধ্যে একজন বড়োলোক উঠে, সে জাতির মধ্যে দেখিতে দেখিতে মহত্ত্বের শিখা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহার গতি আর কেহই রোধ করিতে পারে না।

নানক যে মহত্ত্ব লইয়া জন্মিয়াছিলেন সে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিবিয়া গেল না। তিনি যে ধর্মের সংগীত, যে আনন্দ ও আশার গান গাহিলেন, তাহা ধ্বনিত হইতে লাগিল। কত নূতন নূতন গুরু জাগিয়া উঠিয়া শিখদিগকে মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করিতে লাগিলেন।

তখনকার যথেচ্ছাচারী মুসলমান রাজারা অনেক অত্যাচার করিলেন, কিন্তু নবধর্মোৎসাহে দীপ্ত শিখ জাতির উন্নতির পথে বাধা দিতে পারিলেন না। বাধা ও অত্যাচার পাইয়া শিখেরা কেমন করিয়া বীর জাতি হইয়া উঠিল তাহার গল্প বলি শুন।

নানকের পর পঞ্জাবে আট জন গুরু জন্মিয়াছেন, আট জন গুরু মরিয়াছেন, নবম গুরুর নাম তেগ্‌বাহাদুর। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন নিষ্ঠুর আরঞ্জীব দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। রামরায় বলিয়া তেগ্‌বাহাদুরের একজন শত্রু সম্রাটের সভায় বাস করিত। তাহারই কথা শুনিয়া সম্রাট তেগ্‌বাহাদুরের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

আরঞ্জীবের লোক যখন তেগ্‌বাহাদুরকে ডাকিতে আসিল তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার আর রক্ষা নাই। যাইবার সময়ে তিনি তাঁহার ছেলেকে কাছে ডাকিলেন। ছেলের নাম গোবিন্দ, তাহার বয়স চোদ্দ বৎসর। পূর্বপুরুষের তলোয়ার গোবিন্দের কোমরে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বলিলেন, “তুমিই শিখেদের গুরু হইলে। সম্রাটের আদেশে ঘাতক

আমাকে যদি বধ করে তো আমার শরীরটা যেন শেয়াল-কুকুরে না খায়! আর এই অন্যায় অত্যাচারের বিচার তুমি করিয়ো, ইহার প্রতিশোধ তুমি লইয়ো।' বলিয়া তিনি দিল্লী চলিয়া গেলেন।

রাজসভায় তাঁহাকে তাঁহার গোপনীয় কথা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করা হইল। কেব বা বলিল, "আচ্ছা, তুমি যে মস্ত লোক তাহার প্রমাণস্বরূপ একটা অলৌকিক কারখানা দেখাও দেখি!' তেগ্‌বাহাদুর বলিলেন, "সে তো আমার কাজ নহে। মানুষের কর্তব্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকা। তবে তোমাদের অনুরোধে আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইতে পারি। একটা কাগজে মন্ত্র লিখিয়া ঘাড়ে রাখিয়া দিব, সে ঘাড় তলোয়ারে বিচ্ছিন্ন হইবে না।' এই বলিয়া মন্ত্র-লেখা কাগজ ঘাড়ে রাখিয়া তিনি ঘাড় পাতিয়া দিলেন। ঘাতক তরবারি উঠাইয়া আঘাত করিলে মাথা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কাগজ তুলিয়া লইয়া সকলে দেখিল, তাহাতে লেখা আছে, "শির দিয়া, সির নেহি দিয়া।' অর্থাৎ মাথা দিলাম, গুপ্ত কথা দিলাম না।' এইরূপে মাথা দিয়া তেগ্‌বাহাদুর রাজসভার প্রশ্নের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

বালক গোবিন্দের মনে বড়ো আঘাত লাগিল। মুসলমানদের যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবেন এই তাঁহার সংকল্প হইল। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিলে তো কিছুই হয় না; এখনও সুসময়ের জন্যে ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, আয়োজন করিতে হইবে, বহুদিন অবিশ্রাম চিন্তা করিয়া মনে মনে সমস্ত সংকল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে, তবে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যাহারা দুই দিনেই দেশের উপকার করিয়া সমস্ত চুকাইয়া দিতে চায়, যাহাদের ধৈর্য নাই, যাহারা অপেক্ষা করিতে জানে না, তাহাদের তড়িঘড়ি কাজ ও আড়ম্বর দেখিয়া লোকের চমক লাগিয়া যায়, কিন্তু তাহারা বড়ো লোক নহে, তাহাদের কাজ স্থায়ী হয় না। তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যের জন্য সমস্ত জীবন দিতে চাহে না, জীবনের গোটাকতক দিন দিতে চাহে মাত্র, অথচ তাড়াতাড়ি বড়ো লোক বলিয়া খুব একটা প্রশংসা পাইতে চাহে। গোবিন্দ সেরূপ লোক ছিলেন না। তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া যমুনাতীরের ছোটো ছোটো পাহাড়ের মধ্যে বিজনে পারস্যভাষা-শিক্ষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; বাঘ

ও বন্য শূকর শিকার করিয়া এবং মনে মনে আপনার সংকল্প স্থির করিয়া অবসরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

গুরু গোবিন্দের শিষ্যেরা তাঁহার চারি দিকে জড়ো হইতে লাগিল। সমস্ত শিখজাতিকে একত্রে আহ্বান করিবার জন্য তিনি চারি দিকে তাঁহার শিষ্যদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে সমস্ত পঞ্জাব হইতে বিস্তর লোক আসিয়া তাঁহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, দেব-দৈত্য সকলেই নিজের উপাসনা প্রচলিত করিতে চায়; গোরখনাথ রামানন্দ প্রভৃতি ধর্মমতের প্রবর্তকেরা নিজের নিজের এক-একটা পন্থা বাহির করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে মহম্মদ নিজের নাম উচ্চারণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি, গোবিন্দ, ধর্মপ্রচার, পুণ্যের জয়-বিস্তার ও পাপের বিনাশ-সাধনের জন্য আসিয়াছেন। অন্যান্য মানুষও যেমন তিনিও তেমনি একজন; তিনি পিতা পরমেশ্বরের দাস; এই পরমাশ্চর্য জগতের একজন দর্শক মাত্র; তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া যে পূজা করিবে নরকে তাহার গতি হইবে। কোরান পুরাণ পাঠ করিয়া, প্রতিমা বা মৃত ব্যক্তির পূজা করিয়া, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে বা কোনো প্রকার পূজার কৌশলে ঈশ্বর মিলে না। বিনয়ে ও ভক্তিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

তিনি বলিলেন, “আজ হইতে সমস্ত লোক এক হইয়া গেল। উচ্চ-নীচের প্রভেদ রহিল না। জাতিভেদ উঠিয়া গেল। সকলে অত্যাচারী তুর্ক জাতির বিনাশের ব্রত গ্রহণ করিলাম।’

জাতিভেদ উঠিয়া গেল শুনিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, অনেকে রাগ করিয়া চলিয়া গেল। গোবিন্দ বলিলেন, “যাহারা নীচে আছে তাহাদিগকে উঠাইব, যাহাদিগকে সকলে ঘৃণা করে তাহারা আমার পাশে স্থান পাইবে।’ ইহা শুনিয়া নীচজাতির লোকেরা অত্যন্ত আনন্দ করিতে লাগিল। এই সময়ে গোবিন্দ সমস্ত শিখ জাতিকে সিংহ উপাধি দিলেন। কুড়ি হাজার লোক গোবিন্দের দলে রহিল।

এইরূপে গোবিন্দ শিখ জাতিকে নূতন উৎসাহে দীপ্ত করিয়া ধনমানের আশা বিসর্জন করিয়া নিজের সংকল্প-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দের যদি মনের আশা থাকিত তাহা হইলে তিনি অনায়াসে আপনাকে দেবতা বলিয়া চালাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ধনের প্রতি গোবিন্দের বিরাগ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে বলি। গোবিন্দের একজন ধনী শিষ্য তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের একজোড়া বলয় উপহার দিয়াছিল। গোবিন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি বলয় লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। দৈবাৎ পড়িয়া গেছে মনে করিয়া একজন শিখ পাঁচ শত টাকা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া একজন ডুবারিকে সেই বলয় খুঁজিয়া আনিতে অনুরোধ করিল। সে বলিল, “আমি খুঁজিয়া আনিতে পারি, যদি আমাকে ঠিক জায়গাটা দেখাইয়া দেওয়া হয়।’ শিখ গোবিন্দকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বালা কোন্‌খানে পড়িয়া গেছে। গোবিন্দ অবশিষ্ট বালাটি লইয়া জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, “ওইখানে।’ শিখ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আর খুঁজিল না।

হিমালয়ের ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে গুরু গোবিন্দের এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে গোবিন্দের জয় হয়। মুখোয়াল-নামক স্থানে থাকিয়া গোবিন্দ চারিটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিলেন। দুই বৎসর যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া চারি দিকের অনেক দেশ জয় ও অধিকার করিলেন। পর্বতের রাজারা ইহাতে ভয় পাইয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল। জবর্দস্ত খাঁ ও শম্‌স্‌ খাঁ নামক দুই আমীরকে সম্রাট পার্বত্য রাজাদের সাহায্যে নিয়োগ করিলেন। এইরূপে দুই মুসলমান আমীর এবং পর্বতের রাজারা একত্র হইয়া মুখোয়াল দুর্গ ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্গের বাহিরে সাত মাস ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। অবশেষে গোবিন্দ তাঁহার দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার আহার ফুরাইয়া গেল। তাহা ছাড়া গোবিন্দের অনুচরেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। এ দিকে তাঁহার মা গুজরী একদিন রাত্রে গোবিন্দের দুটি ছেলে লইয়া পলাইয়া গেলেন। কিন্তু ছেলে দুটিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পথের মধ্যে সির্হিন্দ-নামক স্থানে মুসলমানেরা তাহাদিগকে

জীবিত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলে। গুজরী সেই শোকে প্রাণত্যাগ করেন। এ দিকে আহারাভাবে গোবিন্দ অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। তাঁহার অনুচরেরা আর থাকিতে চাহে না। তিনি তাহাদিগকে ভীরু বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। দুর্গের দরজা খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, “এসো, তবে আর-একবার যুদ্ধ করিয়া দেখা যাক। যদি মরি তাহা হইলে কীর্তি থাকিয়া যাইবে; যদি জয়লাভ করি তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল। বীরের মতো মরিলে গৌরব আছে, ভীরুর মতো মরা হীনতা।’ কিন্তু গোবিন্দের কথা কেহ মানিল না। তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়া অনুচরেরা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গেল। কেবল চল্লিশ জন গোবিন্দের সঙ্গে রহিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমরাও যাও!’ তাহারা বলিল, “যে শিখেরা ছাড়িয়া পালাইয়াছে তাহাদিগকে মাপ করো গুরু, আমরা তোমার জন্য প্রাণ দিব।’ এই চল্লিশ জন অনুচর সঙ্গে লইয়া মুখোয়াল হইতে পালাইয়া গুরু চমকৌর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সেখানেও বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে ঘিরিল। প্রাতঃকালে দুর্গের দ্বার খুলিয়া তাঁহারা মুসলমানদের উপর গিয়া পড়িলেন। বিপক্ষ-পক্ষের অনেকগুলিকে মারিলেন এবং তাঁহাদেরও অনেকগুলি মরিল। কেবল পাঁচ জন মাত্র বাকি রহিল। গোবিন্দের দুই পুত্র রণজিৎ ও অজিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ আবার পলায়ন করিলেন। বহুদিন ধরিয়া পথে অনেক বিপদ-আপদ সহ্য করিয়া অবশেষে গোবিন্দ একে একে পলাতক শিষ্যদিগকে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এইরূপে গোবিন্দের অধীনে বারো হাজার সৈন্য জড়ো হইল।

মুসলমানেরা এই খবর পাইয়া তাঁহাকে আবার আক্রমণ করিল। শিখেরা বলিল, “এবার হয় জয় করিব নয় মরিব।’ জয় হইল। মুকতসরের নিকট যুদ্ধে মুসলমানদের সম্পূর্ণ হার হইল। এই জয়ের খবর চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রত্যহ চারি দিক হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া গোবিন্দের দলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সম্রাট আরঞ্জীব তখন দক্ষিণে ছিলেন। গোবিন্দের জয়ের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহার কাছে হাজির হইবার জন্য গোবিন্দকে এক আদেশপত্র পাঠাইয়া দিলেন। গোবিন্দ তাহার উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, “তোমার উপরে আমার কিছুমাত্র

বিশ্বাস নাই। তুমি আমাদের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছ শিখেরা তাহার প্রতিশোধ লইবে।’ গোবিন্দ তাঁহার পত্রে, মোগলেরা শিখগুরুদিগের প্রতি যে-সকল অত্যাচার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “আমার সন্তানেরা বিনষ্ট হইয়াছে; আমার পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি; আমি কাহাকেও ভয় করি না, ভয় করি কেবল জগতের একমাত্র সম্রাট রাজার রাজাকে। ভগবানের নিকট দরিদ্রের প্রার্থনা বিফল হয় না; তুমি যে-সকল অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছ একদিন তাহার হিসাব দিতে হইবে।’ এই পত্রে গোবিন্দ সম্রাটকে লিখিয়াছিলেন যে, “তুমি হিন্দুদিগকে মুসলমান করিয়া থাক, আমি মুসলমানদিগকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়া সুখে আছ, কিন্তু সাবধান, আমি চড়াই পাখিকে শিখাইব বাজপাখিকে কী করিয়া ভূমিশায়ী করিতে হয়!’ পাঁচ জন শিখের হাত দিয়া এই চিঠি গোবিন্দ সম্রাটের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট সেই চিঠি পড়িয়া ক্রুদ্ধ না হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও সেই পাঁচ জন শিখের হাত দিয়া গোবিন্দকে চিঠি ও সওগাত পাঠাইয়া দিলেন। চিঠিতে লিখিয়া দিলেন যে, গোবিন্দ যদি দাক্ষিণাত্যে আসেন তবে সম্রাট তাঁহাকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিবেন। এই চিঠি পাইয়া গোবিন্দ কিছুদিন শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আরঞ্জীবের সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন ও সেই অভিপ্রায়ে দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন পথে তখন আরঞ্জীবের মৃত্যু হইয়াছে। দক্ষিণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাহাদুরশা সম্রাট হইয়াছেন। বাহাদুরশা বহুবিধ সওগাত উপহার দিয়া গোবিন্দকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর অধিপতি করিয়া দিলেন।

গোবিন্দের মৃত্যুঘটনা বড়ো শোচনীয়। কেহ কেহ বলে, ক্রমাগত শোকে বিপদে নিরাশায় অভিভূত হইয়া গোবিন্দ শেষ দশায় কতকটা পাগলের মতো হইয়াছিলেন ও জীবনের প্রতি তাঁহার অতিশয় বিরাগ জন্মিয়াছিল। একদিন একজন পাঠান তাঁহার নিকট একটি ঘোড়া বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল; গোবিন্দ সেই ঘোড়া কিনিয়া তাহার দাম দিতে কিছুদিন বিলম্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে পাঠান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গালি দিয়া তরবারি লইয়া আক্রমণ করিল। গোবিন্দ পাঠানের হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেন।

এই অন্যায় কার্য করিয়া তাঁহার অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি সেই পাঠানের পুত্রকে অনেক অর্থ দান করিলেন। তাহাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তাহার সহিত খেলা করিতেন। একদিন সেই পাঠান-তনয়কে তিনি বলিলেন, “আমি তোমার পিতাক বধ করিয়াছি, তুমি যদি তাহার প্রতিশোধ না লও তবে তুমি কাপুরুষ ভীরু।’ কিন্তু সেই পাঠান গোবিন্দকে অত্যন্ত মান্য করিত, এইজন্য সে গোবিন্দের হানি না করিয়া মনে মনে পালাইবার সংকল্প করিল।

আর-একদিন সেই পাঠানের সহিত শতরঞ্চ খেলিতে খেলিতে গোবিন্দ তাহাকে তাহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। সে আর থাকিতে না পারিয়া গোবিন্দের পেটে ছুরি বসাইয়া দিল।

গোবিন্দের অনুচরেরা সেই পাঠানকে ধরিবার জন্য চারি দিক হইতে ছুটিয়া আসিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, “আমি উহার কাছে অপরাধ করিয়াছিলাম, ও তাহার প্রতিশোধ দিয়াছে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আমিই উহাকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলাম। উহাকে তোমরা ধরিয়ো না।’

অনুচরেরা গোবিন্দের ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া দিল। কিন্তু জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া গোবিন্দ এক দৃঢ় ধনুক লইয়া সবলে নোওয়াইয়া ধরিলেন, সেই চেষ্টাতেই তাঁহার ক্ষতস্থানে সেলাই ছিঁড়িয়া গেল ও তাঁহার মৃত্যু হইল।

গোবিন্দ যে সংকল্প সিদ্ধ করিতে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন সে সংকল্প বিফল হইল বটে, কিন্তু তিনিই প্রধানত শিখদিগকে যোদ্ধৃজাতি করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে একদিন শিখেরা স্বাধীন হইয়াছিল; সে স্বাধীনতার দ্বার তিনিই উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন।

বালক, শ্রাবণ, ১২৯২

শিখ-স্বাধীনতা

গুরু গোবিন্দই শিখদের শেষ গুরু। তিনি মরিবার সময় বন্দা-নামক এক বৈরাগীর উপরে শিখদের কর্তৃত্বভার দিয়া যান। তিনি যে সংকল্প অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান সেই সংকল্প পূর্ণ করিবার ভার বন্দার উপরে পড়িল। অত্যাচারী বিদেশীদের হাত হইতে স্বজাতিকে পরিত্রাণ করা গোবিন্দের এক ব্রত ছিল, সেই ব্রত বন্দা গ্রহণ করিলেন।

বন্দার চতুর্দিকে শিখেরা সমবেত হইতে লাগিল। বন্দার প্রতাপে সমস্ত পঞ্জাব কম্পিত হইয়া উঠিল। বন্দা সির্হিন্দ হইতে মোগলদের তাড়াইয়া দিলেন। সেখানকার শাসনকর্তাকে বধ করিলেন। সির্‌মুরে তিনি এক দুর্গ স্থাপন করিলেন। শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন, এবং জিলা সাহারানপুর মরুভূমি করিয়া দিলেন।

মুসলমানদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। লাহোরের উত্তরে জম্বু পর্বতের উপরে বন্দা নিবাস স্থাপন করিলেন, পঞ্জাবের অধিকাংশই তাঁহার আয়ত্ত হইল।

এই সময়ে দিল্লির সম্রাট বাহাদুরশা'র মৃত্যু হইল। তাঁহার সিংহাসন লইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গোলযোগ চলিতে লাগিল। এই সুযোগে শিখেরা সমবেত হইয়া বিপাশা ও ইরাবতীর মধ্যে গুরুদাসপুর নামক এক বৃহৎ দুর্গ স্থাপন করিল।

লাহোরের শাসনকর্তা বন্দার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হইল। এই জয়ের পর সির্হিন্দে একদল শিখসৈন্য পুনর্বার প্রেরিত হইল। সেখানকার শাসনকর্তা বয়াজিদ্ খাঁ শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন। একজন শিখ গোপনে বয়াজিদের তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল; দিল্লির সম্রাট কাশ্মীরের শাসনকর্তা আবদুল সম্মদ্ খাঁ নামক এক পরাক্রান্ত তুরানিকে শিখদিগের

বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। দিল্লি হইতে তাঁহার সাহায্যার্থে এক দল বাছা বাছা সৈন্য প্রেরিত হইল। সম্মদ্ খাঁও সহস্র সহস্র স্বজাতীয় তুরানি সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। লাহোর হইতে কামান-শ্রেণী সংগ্রহ করিয়া তিনি শিখদিগের উপরে গিয়া পড়িলেন। শিখেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। আক্রমণকারীদের বিস্তর সৈন্য নষ্ট হইল। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া বন্দা গুরুদাসপুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুসৈন্য তাঁহার দুর্গ সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। দুর্গে খাদ্য-যাতায়াত বন্ধ হইল। সমস্ত খাদ্য এবং অখাদ্য পর্যন্ত যখন নিঃশেষ হইয়া গেল তখন বন্দা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ৭৪০ জন শিখ বন্দী হইল। কথিত আছে, যখন বন্দীগণ লাহোরের পথ দিয়া যাইতেছিল তখন বয়াজিদ্ খাঁর বৃদ্ধা মাতা তাহার পুত্রের হত্যাকারীর মস্তকে পাথর ফেলিয়া দিয়া বধ করিয়াছিল। বন্দা যখন দিল্লীতে নীত হইলেন তখন শত্রুরা শিখদের ছিন্নশির বর্শাফলকে করিয়া তাঁহার আগে আগে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। প্রতিদিন একশত করিয়া শিখ বন্দী বধ করা হইত। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছিলেন যে, “শিখেরা মরিবার সময় কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই; কিন্তু অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে,আগে মরিবার জন্য তাহারা আপনা-আপনির মধ্যে বিবাদ ও তর্ক করিত। এমন-কি, এইজন্য তাহারা ঘাতকের সঙ্গে ভাব করিবার চেষ্টা করিত।’ অষ্টম দিনে বন্দা বিচারকের সমক্ষে আনীত হইলেন। একজন মুসলমান আমীর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এমন বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও এত পাপাচরণে তোমার মতি হইল কী করিয়া?’ বন্দা বলিলেন, “পাপীর শাস্তি-বিধানের জন্য ঈশ্বর আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে যাহা-কিছু কাজ করিয়াছি তাহার জন্য আবার আমারও শাস্তি হইতেছে।’ বিচারকের আদেশে তাঁহার ছেলেকে তাঁহার কোলে বসাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহার হাতে ছুরি দিয়া স্বহস্তে নিজের ছেলেকে কাটিতে হুকুম হইল। অবিচলিত ভাবে নীরবে তাঁহার ক্রোড়স্থ ছেলেকে বন্দা বধ করিলেন। অবশেষে দগ্ধ লৌহের সাঁড়াশি দিয়া তাঁহার মাংস ছিঁড়িয়া তাঁহাকে বধ করা হইল।

বন্দার মৃত্যুর পর মোগলেরা শিখদের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক শিখের মাথার জন্য পুরস্কার-স্বরূপ মূল্য ঘোষণা করা হইল।

শিখেরা জঙ্গলে ও দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইল। প্রতি ছয় মাস অন্তর তাহারা একবার করিয়া অমৃতসরে সমবেত হইত। পথের মধ্যে যে-সকল জমিদার ছিল তাহারা ইহাদিগকে পথের বিপদ হইতে রক্ষা করিত। এই ষাণ্‌মাসিক মিলনের পর আবার তাহারা জঙ্গলে ছড়াইয়া পড়িত।

পঞ্জাব জঙ্গলে আবৃত হইয়া উঠিল। নাদিরশা আফগানিস্থান হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সময় পঞ্জাব দিয়া আসিতেছিলেন। নাদিরশা জিজ্ঞাসা করিলেন, শিখদের বাসস্থান কোথায়? পঞ্জাবের শাসনকর্তা উত্তর করিলেন, ঘোড়ার পৃষ্ঠের জিনই শিখদের বাসস্থান।

নাদিরশাহের ভারত-আক্রমণকালে শিখেরা ছোটো ছোটো দল বাঁধিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্তী পারসিক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিতে লাগিল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে রত হইয়া শিখেরা পুনশ্চ দুঃসাহসিক হইয়া উঠিল। এখন তাহারা প্রকাশ্যভাবে শিখতীর্থ অমৃতসরে যাতায়াত করিতে লাগিল। একজন মুসলমান লেখক বলেন– প্রায়ই দেখা যায়, অশ্বারোহী শিখ পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া তাহাদের তীর্থ উপলক্ষে চলিয়াছে। কখনো কখনো কেহ বা ধৃতও হইত, কেহ বা হতও হইত, কিন্তু কখনো এমন হয় নাই যে, একজন শিখ ভয়ে তাহার স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে শিখেরা উত্তরোত্তর নির্ভীক হইয়া ইরাবতীর তীরে এক ক্ষুদ্র দুর্গ স্থাপন করিল। ইহাতেও মুসলমানেরা বড়ো একটা মনোযোগ দিল না। কিন্তু তাহারা যখন বৃহৎ দল বাঁধিয়া আমিনাবাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে কর আদায় করিতে সমবেত হইল, তখন মুসলমান সৈন্য তাহাদের আক্রমণ করিল। কিন্তু মুসলমানেরা পরাজিত হইল ও তাহাদের সেনাপতি বিনষ্ট হইল। মুসলমানেরা অধিকসংখ্যক সৈন্য লইয়া দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিল ও শিখদিগকে পরাভূত করিল। লাহোরে এই উপলক্ষে বিস্তর শিখবন্দী নিহত হয়। যেখানে এই বধকার্য সমাধা হয় লাহোরের সেই স্থান সুহিদগঞ্জ নামে অভিহিত। এখনও সেখানে ভাই তরুসিংহের কবরস্থান আছে। কথিত আছে, তরুসিংহকে তাঁহার দীর্ঘ কেশ ছেদন

করিয়া শিখধর্ম ত্যাগ করিতে বলা হয়। কিন্তু গুরু গোবিন্দের এই বৃদ্ধ অনুচর তাঁহার ধর্ম ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন এবং শিখদের শাস্ত্রানুমোদিত জাতীয় চিহ্নস্বরূপ দীর্ঘ কেশ ছেদন করিতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, “চুলের সঙ্গে খুলির সঙ্গে এবং খুলির সঙ্গে মাথার সঙ্গে যোগ আছে। চুলে কাজ কী, আমি মাথাটা দিতেছি। ’

এইরূপে ক্রমাগত জয়পরাজয়ের মধ্যে সমস্ত শিখ জাতি আন্দোলিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা নিরুদ্যম হইল না। এক সময়ে যখন তাহারা সির্হিন্দের শাসনকর্তা জেইন খাঁর উপরে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে দুর্দান্তপরাক্রম পাঠান আমেদশা তাঁহার বৃহৎ সৈন্যদলসমেত তাহাদের উপর আসিয়া পড়িলেন। এই যুদ্ধে শিখদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়, তাহাদের বিস্তর লোক মারা যায়। আমেদশা অমৃতসরের শিখ-মন্দির ভাঙিয়া দিলেন। গোরক্ত ঢালিয়া অমৃতসরের সরোবর অপবিত্র করিয়া দিলেন। শিখদের ছিন্ন শির স্তূপাকার করিয়া সজ্জিত করিলেন। এবং কাফের শত্রুদের রক্তে মসজিদের ভিত্তি ধৌত করিয়া দিলেন।

কিন্তু ইহাতেও শিখেরা নিরুদ্যম হইল না। প্রতিদিন তাহাদের দল বাড়িতে লাগিল। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি সমস্ত জাতির হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রথমে তাহারা কসুর-নামক পাঠানদের উপনিবেশ আক্রমণ, লুণ্ঠন ও গ্রহণ করিল। তাহার পরে তাহারা সির্হিন্দে অগ্রসর হইল। সেখানকার শাসনকর্তা জেইন খাঁর সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে পাঠান পরাজিত ও নিহত হইল। শতদ্রু হইতে যমুনা পর্যন্ত সির্হিন্দ প্রদেশ শিখদের করতলস্থ হইল। লাহোরের শাসনকর্তা কাবুলিমলকে শিখেরা দূর করিয়া দিল। ঝিলম হইতে শতদ্রু পর্যন্ত সমস্ত পঞ্জাব শিখদের হাতে আসিল। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড সর্দারেরা মিলিয়া ভাগ করিয়া লইলেন। শিখেরা বিস্তর মসজিদ ভাঙিয়া ফেলিল। শৃঙ্খলবদ্ধ আফগানদের দ্বারা শূকররক্তে মসজিদ-ভিত্তি ধৌত করানো হইল। সর্দারেরা অমৃতসরে সম্মিলিত হইয়া আপনাদের প্রভাব প্রচার এবং শিখমুদ্রা প্রচলিত করিলেন।

এতদিন পরে শিখেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল। গুরু গোবিন্দের উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইল। তার পরে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়। তার পরে ব্রিটিশ-সিংহের প্রতাপ। তার পরে ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতবর্ষ লাল হইয়া গেল। রণজিতের বিখ্যাত ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হইল। সে-সকল কথা পরে হইবে।

বালক, আশ্বিন-কার্তিক, ১২৯২

গ্রন্থসমালোচনা

ভারতবর্ষের ইতিহাস। শ্রীহেমলতা দেবী। মূল্য আট আনা।

বিধাতা স্ত্রীজাতিকে এত কোমল করিয়াছেন, যে সেই কোমলতার অবশ্যসহচর দুর্বলতার দ্বারা তাহারা অসহায় এবং পরাধীন। তথাপি তাহা যুগ যুগান্তর চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ ছেলেদের মানুষ করিবার জন্য এই কোমলতা অত্যাবশ্যক। মাকে কোমলকান্ত করিয়া বিধাতা বলিয়াছেন বাল্যাবস্থায় মাধুর্যের আনন্দচ্ছটা এবং স্নেহের সুধাভিষেকে মানুষ পালনীয়। পীড়ন, শাসন, সংকীর্ণ নিয়মের লৌহশৃঙ্খল তখনকার উপযোগী নয়। খাওয়ানো পরানো সম্বন্ধীয় মানুষ করা চিরকাল এইভাবেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল বিস্তার লাভ করিয়াছে। মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এখন মানুষ-করা ব্যাপারটা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এখন কেবল অন্নপান নহে বিদ্যাদানেরও প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু বিধাতার নিয়ম সমান আছে। বাল্যাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গেও আনন্দের স্বাভাবিক স্ফূর্তি এবং স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক। কিন্তু অবস্থাগতিকে পুরুষের হাতে বিদ্যাদানের ভার পড়িয়া জগতে বহুল দুঃখ এবং অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। বালকের স্বাভাবিক মুগ্ধতার প্রতি পুরুষের ধৈর্য নাই, শিশুচরিত্রের মধ্যে পুরুষের সস্নেহ প্রবেশাধিকার নাই। আমাদের পাঠালয় এবং পাঠ্যনির্বাচনসমিতি তাহার নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত। এইজন্য মানুষের বাল্যজীবন নিদারুণ নিরানন্দের আকর হইয়া উঠিয়াছে। পুনরায় শিশু হইয়া জন্মিয়া বিদ্যালাভ করিতে হইবে এই ভয়ে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মত এই যে, মা মাসি দিদিরাই অন্নপান ও জ্ঞান শিক্ষার দ্বারা বিশেষ বয়স পর্যন্ত ছেলেদের সর্বতোভাবে পালন পোষণ করিবেন। তাহাই তাঁহাদের কর্তব্য। বেত্রবজ্রধর গুরুমহাশয় তাঁহাদের স্নেহস্বর্গের অধিকার হরণ করিয়া লইয়াছে। ছেলে যখন কাঁদিতে কাঁদিতে পাঠশালায় যায় তখন মাকে কি কাঁদাইয়া যায় না? এই প্রকৃতিদ্রোহী অবস্থা কি চিরদিন জগতে থাকিবে?

সমালোচ্য বাল্যপাঠ্যগ্রন্থখানি শিক্ষিত মহিলার রচনা বলিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি শিশুদিগকে শিক্ষা দান তাঁহাদের শিক্ষালাভের একটি প্রধান সার্থকতা। অধুনা আমাদের দেশের অনেক স্ত্রীলোক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের সেই শিক্ষা যদি তাঁহারা মাতৃভাষায় বিতরণ করেন তবে বঙ্গগৃহের লক্ষ্মীমূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সরস্বতীমূর্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী যে ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন স্কুলে প্রচলিত সাধারণ ইতিহাসের অপেক্ষা দুই কারণে তাহা শ্রেষ্ঠ। প্রথমত তাহার ভাষা সরল, দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসের একটি চেহারা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকর্ত্রী প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের মতে ইতিহাসের নামাবলী ও ঘটনাবলী মুখস্থ করাইবার পূর্বে আর্য ভারতবর্ষ, মুসলমান ভারতবর্ষ এবং ইংরেজ ভারতবর্ষের একটি পুঞ্জীভূত সরস সম্পূর্ণ চিত্র ছেলেদের মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। তবেই তাহারা বুঝিতে পারিবে ঐতিহাসিক হিসাবে ভারতবর্ষ জিনিসটা কী। এমন-কি, আমরা বলি, ভারতবর্ষের ভূগোল ইতিহাস এবং সমস্ত বিবরণ জড়াইয়া শুদ্ধমাত্র “ভারতবর্ষ’ নাম দিয়া একখানি বই প্রথমে ছেলেদের পড়িতে দেওয়া উচিত। পরে ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস পৃথকভাবে ও তন্ন তন্ন রূপে শিক্ষা দিবার সময় আসিবে। আমরা বোধ করি ইংরাজিতে এরূপ গ্রন্থের বিস্তৃত আদর্শ সার্ উইলিয়ম্ হন্টারের “ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার’। এই সুসম্পূর্ণ সুন্দর পুস্তকটিকে যদি কোনো শিক্ষিত মহিলা শিশুদের অথবা তাহাদের পিতামাতাদের উপযোগী করিয়া বাংলায় রচনা করেন তবে বিস্তর উপকার হয়।

কিন্তু টেক্সট্বুক্ কমিটির খাতিরে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার বইখানিকে যে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতো করিয়া লিখিতে পারেন নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। ইস্কুলে ছেলেদের যে-সকল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক শুষ্ক তথ্য মুখস্থ করিতে দেওয়া হয় লেখিকা তাহার সকলগুলি বর্জন করিতে সাহসী হন নাই। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, মোগল রাজত্বের পূর্বে তিনশত বৎসরব্যাপী কালরাত্রে ভারত সিংহাসনে দাসবংশ হইতে লোদিবংশ পর্যন্ত পাঠান রাজন্যবর্গের যে রক্তবর্ণ উল্কাবৃষ্টি হইয়াছে তাহা আদ্যোপান্ত কাহারই বা মনে

থাকে। এবং মনে রাখিয়াই বা ফল কী? অন্তত এ ইতিহাসে তাহার একটা মোটামুটি বর্ণনা থাকিলেই ভালো হইত। নীরস ইংরাজ শাসনকাল সম্বন্ধেও আমাদের এই মত।

ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে আর্য-ইতিবৃত্তের তারিখ সম্বন্ধে মৌনাবলম্বনই শ্রেয়। "খৃষ্ট জন্মের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম দিক্ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন", "ভারতবর্ষে আসিবার একহাজার বৎসর পরে তাঁহারা মিথিলা প্রদেশ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন"- এ-সমস্ত সম্পূর্ণ আনুমানিক কালনির্দেশ আমরা অসংগত জ্ঞান করি।

সিরাজদৌল্লার রাজ্যশাসনকালে অন্ধকূপহত্যার বিবরণ লেখিকা অসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের "সিরাজদ্দৌলা" পাঠ করিতেন তবে এ ঘটনাকে ইতিহাসে স্থান দিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইতেন।

মুর্শিদাবাদ কাহিনী। শ্রীনিখিলরায় প্রণীত। মূল্য কাগজে বাঁধা দুই টাকা, কাপড়ে বাঁধা ২ টাকা আট আনা।

মুসলমানের রাজত্ব গিয়াছে অথচ কোথাও তাহার জন্য শূন্য স্থান নাই। ইংরাজ রাজত্বের রেলের বাঁশি, স্টীমারের বাঁশি, কারখানার বাঁশি চারি দিকে বাজিয়া উঠিয়াছে- চারি দিকে আপিস ঘর, আদালত ঘর, থানা ঘর মাথা তুলিতেছে, ইংরাজের নূতন চুনকামকরা ফিট্-ফাট্ ধব্ধবে প্রতাপ দেশ জুড়িয়া ভিত্তি গাড়িয়াছে- কোথাও বিচ্ছেদ নাই। তথাপি নিখিলবাবুর মুর্শিদাবাদকাহিনী পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এই নূতন কর্মকোলাহলময় মহিমা মরীচিকাবৎ নিঃশব্দে অন্তর্হিত, তাহার পাটের কলের সমস্ত বাঁশি নীরব, কেবল আমাদের চতুর্দিকে মুসলমানদের পরিত্যক্ত পুরীর প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া। নিঃশব্দ নহবৎখানা, হস্তীহীন হস্তীশালা, প্রভুশূন্য রাজতক্ত, প্রজাশূন্য আম্ দরাবর, নির্বাণদীপ বেগম মহল একটি পরম বিষাদময় বৈরাগ্যময় মহত্ত্বে বিরাজ করিতেছে। মুসলমান রাজলক্ষ্মী যেন শতাধিক বৎসর পরে তাহার সেই অনাথ পুরীর মধ্যে গোপনে প্রবেশ করিয়া একে একে তাহার পূর্বপরিচিত কীর্তিমালার ভগ্ন চিহ্নসকল অনুসরণ করিয়া সনিশ্বাসে দূরস্মৃতি আলোচনায় নিরত হইয়াছে।

নিখিলবাবু তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধে সেকাল একালের তুলনা বা ভালোমন্দ বিচারের অবতারণা করেন নাই। তিনি সেই প্রাচীন কালকে খণ্ড খণ্ড চিত্র আকারে নিবদ্ধ করিয়া পাঠকদের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানি যেন নবাবী আমলের ভগ্নশেষের অ্যালবম্। চিত্রগুলি সেদিনকার অসীম ঐশ্বর্য এবং বিচিত্রব্যাপারসংকুল মহৎ প্রতাপের অবসানদশার জন্য একটি স্নিগ্ধ করুণা এবং গভীর বিষাদের উদ্রেক করিতেছে।

এ প্রকার ঐতিহাসিক চিত্রগ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। নিখিলবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন জেলা-নিবাসী লেখকগণ তাঁহাদের স্থানীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্রাবলী সংকলন করিতে থাকেন তাহা হইলে বাংলাদেশের সহিত বঙ্গবাসীর যথার্থ সুদূরব্যাপী পরিচয় সাধন হইতে পারে। নিখিলবাবুর এই সদ্দৃষ্টান্ত, তাঁহার এই গবেষণা ও অধ্যবসায়ের জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এই বৃহৎ গ্রন্থে কেবল একটি নিন্দার বিষয় উল্লেখ করিবার আছে। নিখিলবাবু যেখানে সরলভাবে ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার রচনা অব্যাহতভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু যেখানে তিনি অলংকার প্রয়োগের প্রয়াস পাইয়াছেন সেখানে তাঁহার লেখার লাবণ্য বৃদ্ধি হয় নাই, পরন্তু তাহা ভারগ্রস্ত হইয়াছে।

ভারতী, জৈষ্ঠ্য, ১৩০৫

ঐতিহাসিক চিত্র

ঐতিহাসিক চিত্রের সূচনা লিখিবার জন্য সম্পাদক-দত্ত অধিকার পাইয়াছি, আর কোনো প্রকারের অধিকারের দাবি রাখি না। কিন্তু আমাদের দেশের সম্পাদক ও পাঠকবর্গ লেখকগণকে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন তাহাতে অনধিকার প্রবেশকে আর অপরাধ বলিয়া জ্ঞান হয় না।

এই ঐতিহাসিক পত্রে আমি যদি কিছু লিখিতে সাহস করি তবে তাহা সংক্ষিপ্ত সূচনাটুকু। কোনো শুভ অনুষ্ঠানের উৎসব-উপলক্ষে ঢাকীকে মন্ত্রও পড়িতে হয় না, পরিবেশনও করিতে হয় না– সিংহদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সে কেবল আনন্দধ্বনি ঘোষণা করিতে থাকে। সে যদিচ কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কেহই নহে, কিন্তু সর্বাগ্রে উচ্চকলরবে কার্যারম্ভের সূচনা তাহারই হস্তে।

যাঁহারা কর্মকর্তা, গীতা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে: কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। অর্থাৎ, কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কদাচ নাই। আমরা কর্মকর্তা নহি। আমাদের একটা সুবিধা এই যে, কর্মে আমাদের অধিকার নাই, কিন্তু ফলে আছে! সম্পাদক-মহাশয় যে অনুষ্ঠান ও যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন তাহার ফল বাংলার, এবং আশা করি অন্য দেশের, পাঠকমণ্ডলী চিরকাল ভোগ করিতে পারিবেন।

অদ্য “ঐতিহাসিক চিত্রে’র শুভ জন্মদিনে আমরা যে আনন্দ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা কেবলমাত্র সাহিত্যের উন্নতিসাধনের আশ্বাসে নহে। তাহার আর-একটি বিশেষ কারণ আছে।

পরের রচিত ইতিহাস নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং

রচনা করিবার যে উদ্‌যোগ সেই উদ্‌যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে, সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য– আমাদের প্রাণ।

বঙ্গদর্শনের প্রথম অভ্যুদয়ে বাংলাদেশের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, একটি সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যে বাংলার পাঠকহৃদয় যেন কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আনন্দ স্বাধীন চেষ্টার আনন্দ। সাহিত্য যে আমাদের আপনাদের হইতে পারে, সেদিন তাহার ভালোরূপ প্রমাণ হইয়াছিল। আমরা সেদিন ইস্কুল হইতে, বিদেশী মাস্টারের শাসন হইতে, ছুটি পাইয়া ঘরের দিকে ফিরিয়াছিলাম।

বঙ্গদর্শন হইতে আমরা “বিষবৃক্ষ’, “চন্দ্রশেখর’, “কমলাকান্তের দপ্তর’ এবং বিবিধ ভোগ্য বস্তু পাইয়াছি, সে আমাদের পরম লাভ বটে। কিন্তু সকলের চেয়ে লাভের বিষয় সাহিত্যের সেই স্বাধীন চেষ্টা। সেই অবধি আজ পর্যন্ত সে চেষ্টার আর বিরাম হয় নাই। আমাদের সাহিত্যের ভাবী আশার পথ চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গদর্শন আমাদের সাহিত্যপ্রাসাদের বড়ো সিংহদ্বারটা খুলিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার এক-একটি মহলের চাবি খুলিবার সময় আসিয়াছে। “ঐতিহাসিক চিত্র’ অদ্য “ভারতবর্ষের ইতিহাস’ নামক একটা প্রকাণ্ড রুদ্ধবাতায়ন রহস্যাবৃত হর্ম্যশ্রেণীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

সম্পাদক-মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবনাপত্রে জানাইয়াছেন– “নানা ভাষায় লিখিত ভারতভ্রমণ-কাহিনী এবং ইতিহাসাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, অনুসন্ধানলব্ধ নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য, আধুনিক ইতিহাসাদির সমালোচনা এবং বাঙালি রাজবংশ ও জমিদারবংশের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।’

এই তো প্রত্যক্ষ ফল। তাহার পর পরোক্ষ ফল সম্বন্ধে আশা করি যে, এই পত্র আমাদের দেশে ঐতিহাসিক স্বাধীন চেষ্টার প্রবর্তন করিবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিতে না পারিলে, “ঐতিহাসিক চিত্র’ দীর্ঘকাল আপন মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না– সমস্ত দেশের সহকারিতা না পাইলে ক্রমে সংকীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া লুপ্ত হইবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিয়া যদি “ঐতিহাসিক চিত্রে’র মৃত্যু হয়, তথাপি সে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশা করিতে পারি না, কিন্তু বাংলার প্রত্যেক জেলা যদি আপন স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করেন এবং বাংলার রাজবংশের পুরাতন দপ্তরে যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে “ঐতিহাসিক চিত্র’ তাহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে, তবেই এই ত্রৈমাসিক পত্র সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে।

এখন সংগ্রহ এবং সমালোচনা ইহার প্রধান কাজ। সমস্ত জনশ্রুতি, লিখিত এবং অলিখিত, তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা– এই পত্রভাণ্ডারে সংগ্রহ হইতে থাকিবে। যাহা তথ্য-হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাস-রূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায়। কারণ, ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস। আমরা একান্ত আশা করিতেছি, এই সংগ্রহকার্যে “ঐতিহাসিক চিত্র’ সমস্ত দেশকে আপন সহায়তায় আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিবে।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র শ্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে– বন্ধ্য এবং অবন্ধ্য (productive এবংunproductive)। বিলাসসামগ্রী যে শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন তাহাকে বন্ধ্য বলা যায়; কারণ, ভোগেই তাহার শেষ, তাহা কোনোরূপে ফিরিয়া আসে না। আমরা আশা করিতেছি, “ঐতিহাসিক চিত্র’ যে শ্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহা বন্ধ্য হইবে না; কেবলমাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্তিতেই তাহার অবসান নহে। তাহা দেশকে যাহা দান করিবে তাহার চতুর্গুণ

প্রতিদান দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে, একটি বীজ রোপণ করিয়া তাহা হইতে সহস্র শস্য লাভ করিতে থাকিবে।

আমাদের দেশ হইতে রূঢ় দ্রব্য বিলাতে গিয়া সেখানকার কারখানায় কারুপণ্যে পরিণত হইয়া এ দেশে বহুমূল্যে বিক্রীত হয়– তখন আমরা জানিতেও পারি না তাহার আদিম উপকরণ আমাদের ক্ষেত্র হইতেই সংগৃহীত। যখন দেশের কোনো মহাজন এইখানেই কারখানা খোলেন তখন সেটাকে আমাদের সমস্ত দেশের একটা সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া জ্ঞান করি।

ভারত-ইতিহাসের আদিম উপকরণগুলি প্রায় সমস্তই এখানেই আছে; এখনও যে কত নূতন নূতন বাহির হইতে পারে তাহার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু, কী বাণিজ্যে, কী সাহিত্যে, ভারতবর্ষ কি কেবল আদিম উপকরণেরই আকর হইয়া থাকিবে? বিদেশী আসিয়া নিজের চেষ্টায় তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজের কারখানায় তাহাকে না চড়াইলে আমাদের কোনো কাজেই লাগিবে না?

“ঐতিহাসিক চিত্র’ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্বদেশী কারখানাস্বরূপ খোলা হইল। এখনও ইহার মূলধন বেশি জোগাড় হয় নাই, ইহার কল-বলও স্বল্প হইতে পারে, ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশেও যে গভীর দৈন্য– যে মহৎ অভাব-মোচনের আশা করা যায় তাহা বিলাতের বস্তা বস্তা সূক্ষ্ম ও সুনির্মিত পণ্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে।

ঐতিহাসিক চিত্র, পৌষ, ১৩০৫